এই সময়

* কথাসরিৎ *

ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেককে আলাদা করে দেখলে, মানুষের মধ্যে, অন্তত কোনো কোনো মানুষের মধ্যে— আমরা দেখতে চাই বুদ্ধির দীপ্তি, শরীরের রেখায় সামঞ্জস্যের আভাস, তার সংস্পর্শে পাই প্রাণের উজ্জীবন।

— বুদ্ধদেব বসু

অশালীন?

নগরসভ্যতার ভিত্তিমূলে বিশ্বাস, আচরণ ও মতামতের বৈচিত্র এবং সেই বৈচিত্রকে মান্যতা দেওয়ার মানসিকতা। যে কারণে নগর সদাই পরিবর্তনশীল সময়ের সঙ্গে, বস্তুত সামাজিক নিয়ম বদলের অগ্রদূত। তৎসহ এটিও ঐতিহাসিক সত্য যে সব পরিবর্তনই ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই সম্পন্ন হয়। উনিশ শতকের বঙ্গদেশে, বিশেষত কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে যখন সমাজ পাল্টানোর সচেতন প্রয়াস, তখন ঐতিহ্যরক্ষার অজুহাতে তাকে বহু বাধার সম্মুখীনই হতে হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে তা সহিংস। তারই একটি একুশ শতকীয় সংস্করণ সম্প্রতি কলকাতা মেট্রো রেলে দেখা গেল। জনৈক যুবক-যুবতীর প্রকাশ্যে আলিঙ্গন নিয়ে আপত্তি, বাদানুবাদ, যা শেষ পর্যন্ত নিগ্রহের চেহারা নেয়। অর্থাৎ, সামাজিক আচরণে কোনও রকম বদল মেনে নিতে বঙ্গীয় সমাজের এক বৃহদংশ এখনও নারাজ, এবং এ ক্ষেত্রেও অজুহাতটি সেই উনিশ শতক থেকেই ধার করে আনা- ঐতিহ্য। সমস্যা হল, ঐতিহ্য বিষয়টি অনড় বস্তু নয়। অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতকের পরিণয়, দাম্পত্য এবং পারিবারিক জীবন আশিরনখ পাল্টে গিয়েছে বিংশ শতাব্দীতে, এবং সেই বদলের পালাটি চলছে এবং চলতে থাকবেও, কারণ সেটিই নিয়ম। সেই স্রোতের মুখে বালির বাঁধ দেওয়ার প্রচেষ্টাটি অক্ষম, এবং অক্ষমতা অবশ্যই ক্রোধেরও জন্ম দেয়।

সমস্যাটি সর্বভারতীয়। সামাজিক রক্ষণশীলতা এবং তার নখদন্তের প্রকাশ মুহুর্মুহু এবং সর্বত্র। বঙ্গীয় সমাজের ছদ্ম-প্রগতিশীলতার নির্মোকটি খসে পড়লে মালুম হয় যে বাঙালিও একই পথের পথিক। সেই পথটিকে অনেক ক্ষেত্রে বৈধতা দেওয়া হয় আইনি যুক্তিতে, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২৯৪ ধারা, যেটি অনুসারে জনপরিসরে অশালীন আচরণ শাস্তিযোগ্য। সমস্যা হল, 'অশালীন' শব্দটির সংজ্ঞা কী? প্রকাশ্যে আলিঙ্গন, এমনকি চুম্বনও যে তার মধ্যে পড়ে না, সেটি স্পষ্ট দিল্লি হাইকোর্টের একটি রায়ে। কাজেই মূল প্রশ্নটি আইনি নয়, সামাজিক বৈধতার। একদা প্রকাশ্য রাস্তায় মহিলাদের বেরনো অশালীন এবং সামাজিক নিয়মের লঙ্ঘন হিসেবেই পরিগণিত হত। এই মুহূর্তে তা অভাবনীয়। অতএব সম্ভব এবং অসম্ভবের সীমারেখাটি প্রতিনিয়ত সময়ই পাল্টে দিতে থাকে। তার বিরুদ্ধাচরণ সময় ও শ্রমের অপব্যয় মাত্র। বিশেষত রক্ষণশীলতার বিপ্রতীপেই যখন সেই সব তরুণ-তরুণীর বিপুল উপস্থিতি, যারা নিরর্থক ও অযৌক্তিক নিগড়ে নিজেদের বেঁধে রাখতে নারাজ। সে যৌবনজলতরঙ্গ রোধিবে কে?

সচেতনতা

পুরাকালে সামগ্রী বিনিময়ের মাধ্যমে বেচাকেনা চলত। যুগ পরিবর্তনের ফলে কড়ি, মুদ্রা, কাগজের টাকা ইত্যাদির প্রবর্তন হয় বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর এসেছে চেক বিনিময় ব্যবস্থা। আধুনিক কালে মুদ্রা, কাগজের টাকা এবং চেকের জায়গা নিয়েছে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মতো প্লাস্টিক টাকা এবং সেই সঙ্গে টাকার ব্যবহার আরও কমানোর উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হয়েছে অন্তর্জাল বেচাকেনার বিপণি। ইন্টারনেট ব্যবস্থার বহুল প্রচলনের ফলে এই অন্তর্জাল বেচাকেনা বা ই-কমার্স শুধু শহুরে শিক্ষিত বিত্তবানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, তা ছড়িয়ে পড়েছে অনেক দূর পর্যন্ত। নগদহীন এই বেচাকেনা ব্যবস্থায়

অশোক মিত্রের গর্ব ছিল যে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাঁর জন্ম এবং তাঁর চেতনা জুড়ে মার্কসীয় প্রজ্ঞার প্লাবন

পার্টিতন্ত্রের ঊর্ধ্বে আদ্যোপান্ত 'রাজনৈতিক' মানুষ

একজন 'পাবলিক ইন্টেলেকচুয়াল'-এর যা কাজ, সাধারণ মানুষকে নানা বিষয়ে অবহিত করা, সেটিই তিনি করে গিয়েছেন সারা জীবন। লিখছেন **মইদুল ইসলাম**

গত পয়লা মে অশোক মিত্রের জীবনাবসান হয়েছে। খবরটা পাই যখন কর্মস্থলে পৌঁছে দেখি ওনার মৃত্যু সংবাদ ইনস্টিটিউটের নোটিস বোর্ডে সাঁটানো আছে। ঠিক হল ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর এবং একজন সিনিয়র অধ্যাপিকার সঙ্গে অশোকবাবুর বাড়ি যাওয়া হবে। কিছু বন্ধুবান্ধবকে যখন যোগাযোগ করা হল তখন অনেকেই সেখানে পৌঁছে গেছে। আরও কয়েকজনের অপেক্ষায় থাকা হল যাঁরা ওঁর শেষকৃত্যে উপস্থিত হবার জন্য দ্রুত গতিতে রাস্তায় আছে।

অশোকবাবু অর্থনীতিতে প্রথম নোবেল পুরস্কার জয়ী, ইয়ান টিনবার্জেন-এর কাছে ডক্টরেট করেছিলেন। দেশে বিদেশে পড়িয়েছেন। এবং সারা জীবন শিক্ষকতার পেশা না করে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। সক্রিয় রাজনীতি এবং গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই সব কথা অনেকেরই জানা। তাঁর পাণ্ডিত্য নিয়ে কথা বলবার ধৃষ্টতা এই অধমের নেই। ২০১১ সাল থেকে মাঝে মাঝে খুব কাছে থেকে তাঁর সঙ্গে বার্তালাপের সৌভাগ্য হয়েছিল। কলকাতা ও দিল্লিতে ছাত্রজীবনে একটু দূর থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। সেই সব টুকরো টুকরো স্মৃতি আজও মনকে নাড়া দেয়।

গত একত্রিশ মার্চ, এক বন্ধু বিয়োগের পরের দিন কলকাতার এক নার্সিং হোমে অশোকবাবু ভর্তি ছিলেন। একটাই আক্ষেপ তাঁকে নার্সিং হোমে দেখতে যাওয়ার আর অবকাশ হয়নি। সস্ত্রীক যখন তাঁর বাড়িতে ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বিয়ের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণপত্র দিতে গিয়েছিলাম তখন উনি অভিমানের সুরে বলেছিলেন যে 'তা হলে কেবল এই জন্য তুমি বাড়িতে এসেছ'? ২০১৬ সালে যখন উনি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তখন একবার দেখতে যাবার সময় ওঁর কঠিন ব্যাধি এবং পীড়া নিয়ে ঠিক মনে করে আমার এবং আমার স্ত্রী জেনিফারের কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। 'আরেক রকম' পত্রিকায় নিয়মিত লিখি না বলে দুঃখ করতেন। আমি ফোনে বা দেখাসাক্ষাৎ হলে অতি লজ্জিত হয়ে একটা কুযুক্তি দিতাম ছাত্র-ছাত্রী পড়িয়ে, গবেষণার কাজ করে, এবং পারিবারিক জীবনে সময় দিয়ে 'আরেক রকম' পত্রিকায় লেখার জন্য সময় বার করতে পারি না বলে।

প্রেসিডেন্সি কলেজে তখন ছাত্র। সেই সময় থেকে অশোক মিত্রর প্রবন্ধের অনুরাগী ছিলাম। সেই প্রবন্ধগুলো একটি সুবিখ্যাত প্রথম শ্রেণির ইংরেজি ও বাংলা দৈনিকে নিয়মিত প্রকাশিত হত এবং যা তিনি গত মার্চ মাস পর্যন্ত লিখেছেন। প্রাক্তন সাংসদ হীরেন মুখোপাধ্যায়ের এক সংবর্ধনা সভা আয়োজন হয়েছে শিশির মঞ্চে। অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি এবং তদুপরি তাবড় সব বামফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ মঞ্চে উপস্থিত। অশোকবাবুকে মঞ্চে ডাকা হয়নি। কিন্তু ওঁকে হীরেনবাবু সম্পর্কে কিছু কথা বলতে বলা হল। তাঁর অনেক কথার মধ্যে একটি কথা আজও মনে গেঁথে আছে। উনি বলেছিলেন 'আমাদের প্রজন্মের কেউ যদি কখনও ভুল করি তখন যাঁদের কাছে গেলে বকুনি খেতে পারি তাঁদের মধ্যে একজন হলেন *হীরেন মুখার্জী*'। *বক্তব্য শেষে উনি গট গট করে মঞ্চ থেকে* নেমে গেলেন। দোর্দণ্ডপ্রতাপ এক বামফ্রন্ট নেতা 'অশোকদা, অশোকদা, আপনি মঞ্চে বসুন' বলে তাঁকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু উনি ঠিক শ্রোতাদের বসবার প্রথম সারিতে গিয়ে বসলেন। যেখানে উনি আগে বসেছিলেন। জেদি বাঙাল বলে ওঁর ঘনিষ্ঠ মহলে একই সঙ্গে সুনাম ও দুর্নাম ছিল।

কৌশিক রায়

২০০৫ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম তারিখ সেলস ট্যাক্স উঠে গিয়ে তখন ভ্যাট কর বসেছে। অশোকবাবুর প্রাক্তন পার্টির পার্টি কংগ্রেস এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সেই উপলক্ষ্যে বামফ্রন্টের সবথেকে বড়ো পার্টির ঘনিষ্ঠ বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে এক আলোচনাসভার আয়োজন হয়েছিল। সেই আলোচনাসভায় উনি অকপট ভাষায় ভ্যাট করের বিরোধিতা করেছিলেন। নিজের কথা মুক্ত মনে বলতে ওনার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন সহজ কথা যায় না বলা সহজে। আজকের জমানায় রবীন্দ্রনাথ হয়তো বলতেন সোজা কথা যায় না বলা সহজে। অশোকবাবু সোজা কথা সোজা-সাপ্টা ভঙ্গিতে কোনও রকম দেখনদারি ছাড়াই বলতে পারতেন। অশোকবাবু প্রকৃত অর্থে বুদ্ধিজীবী ছিলেন। উনি পরজীবী

ছিলেন না। এক পাবলিক ইন্টেলেকচুয়ালের যা কাজ, পাবলিককে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা, তিনি জীবনের শেষ লগ্ন পর্যন্ত সেই কাজ করে গিয়েছিলেন।

সাদাকে সাদা, কালোকে কালো আর রঙিনকে রঙিন, *ইংরেজিতে যাকে বলে স্পেডকে স্পেড বলা তা করতে* তাঁর কোনও জড়তা ছিল না। ইঁদুর দৌড়ের জমানায় প্রগতিশীল রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং মতাদর্শগত অবস্থানগুলো যখন অনেকের মধ্যে ফিকে হয়ে যাচ্ছে, রাজনীতিও যখন অনেকের কাছে আর পাঁচটা পেশার মতো একটা কেরিয়ার হয়ে গেছে, এহেন সন্ধিক্ষণে পার্টিতন্ত্রের উপরে উঠে আদ্যোপান্ত এক 'রাজনৈতিক' মানুষ ছিলেন যা কেরিয়ার রাজনীতিকদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচের।

তাঁর সঙ্গে আপনি একমত হতে পারতেন। কখনও নাই হতে পারতেন। তাঁর লেখা নিয়ে সমালোচনা (একমত এবং দ্বিমত পোষণ করে আলোচনা) করে পত্র-পত্রিকায় পাঠক চিঠি লিখেছে। আমাদের প্রজন্ম এবং আমাদের আগে ও পরের প্রজন্মের অনেক মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে এবং গড্ডলিকা প্রবাহে পড়ে অনেকে কেবলমাত্র সারাক্ষণ সোশ্যাল মিডিয়ায় পড়ে থাকেন যা এখন অনেকের ক্ষেত্রে প্রায় নেশার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এহেন সময়ে, আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে তাঁর মতো মানুষের কাছে যিনি নিজের রাজনৈতিক মতে অবিচল থেকে বন্ধুবান্ধব এবং কচিকাঁচাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ

> দুর্ভাগ্য যে গত দেড় দশকে তাঁর প্রাক্তন পার্টির কমরেডরা পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন নিয়ে তাঁর গভীর চিন্তামূলক উপদেশগুলো উপেক্ষা করেছিল। তার জলজ্যান্ত উদাহরণ সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-নেতাই পর্বে তাঁর প্রবন্ধগুলো এবং তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার ও বামফ্রন্ট নেতৃত্বের ক্রিয়াকলাপ।

রাখতে এবং আড্ডা দিতে ভালোবাসতেন। আজকের সোশ্যাল মিডিয়ার জমানায় যখন ধৈর্য ধরে অধ্যয়ন করার অভ্যেস হারিয়ে যাচ্ছে এবং অনেক সময় যখন ফেসবুককে ফেকবুকে পরিণত করা হচ্ছে, কোনও একটি বিষয়ে না জেনেই সবজান্তার ভান করা হচ্ছে, এবং প্রায় সব বিষয়েই 'লাইক' দিয়ে নিজের বিবেককে শান্ত করা হচ্ছে কিন্তু বৃহত্তর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে কিংবা কোনও প্রকারের উৎপাদনক্ষম কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত করা হচ্ছে না, এমন নিরাপদ পথ তিনি বেছে নেননি। তাঁর ভাষায় 'ঝেড়ে কাশতে' তাঁর যখন ইচ্ছে করত তিনি তা করতেন এবং সেই কারণে তিনি একের পর এক প্রবন্ধ লিখেছেন। পাঠককুল সমৃদ্ধ হয়েছেন।

প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত গায়িকা, সুচিত্রা মিত্রের জীবনাবসানের পরে এক আবেগপূর্ণ স্মৃতিচারণা করেছিলেন। সেই স্মৃতিচারণা পড়তে গিয়ে মনে হবে কী মাধুর্যপূর্ণ বন্ধুত্ব ছিল দু'জনের মধ্যে এবং কী শ্রদ্ধাশীল ছিলেন একে অপরের প্রতি। চারিদিকে যখন জ্যাঠামশাইগিরি নীতি পুলিশের দাপাদাপি তখন একজন পুরুষ ও মহিলা যে ভালো বন্ধু হতে পারেন সেই কথা পরিষ্কার হয় ওই স্মৃতিচারণা থেকে।

ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় একবার বলেছিলেন আমাদের দেশ 'গুরুবাদের দেশ'। তাই ওঁর প্রাক্তন পার্টির নেতাদের আত্মসমালোচনা দরকার। পার্টির নীচের তলার কর্মীদের অনেক আগে। কারণ মাছ পচার আগে সব থেকে আগে মাছের মাথা পচে। কিন্তু যতটুকু বুঝেছি উনি নিজে গুরুবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না, আনুষ্ঠানিক গুরুপূজনে ঘোরতর বিরোধী ছিলেন এবং স্বভাবত অনেক তথাকথিত 'গুরু'দের বাদ দিয়েই চলতেন। সেই দিক থেকে তিনি দার্শনিক ভাবে পৌত্তলিক ঘরানার বাসিন্দা ছিলেন না। কেবল এইটুকু তাঁর গর্ব ছিল যে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাঁর জন্ম ও তাঁর চেতনা জুড়ে মার্কসীয় প্রজ্ঞার প্লাবন।

নাতি-নাতনির বয়সী অতিথিও ওঁর বাড়ি গেলে নিজে হাতে চা করে খাওয়াতেন। লিফট পর্যন্ত ছেড়ে আসতেন। এ রকম ভদ্রলোক হয়েও উনি নিজেকে ভদ্রলোকের আগে কমিউনিস্ট বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। বাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য তিনি চিরকাল কলম ধরেছেন। কিন্তু বাংলাবাদিতার নামে তিনি বাঙালি মৌলবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর অগুনতি বাঙালি এবং অবাঙালি বন্ধু-বান্ধবী ছিল। তাঁদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখতেন এবং তাঁরা সময় অসময়ে তাঁকে তাঁদের সাধ্যমতো সাহায্য করতেন। দুর্ভাগ্য যে গত দেড় দশকে তাঁর প্রাক্তন পার্টির কমরেডরা পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন নিয়ে তাঁর গভীর চিন্তামূলক উপদেশগুলো উপেক্ষা করেছিল।

তার জলজ্যান্ত উদাহরণ সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-নেতাই পর্বে তাঁর প্রবন্ধগুলো এবং তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার ও বামফ্রন্ট নেতৃত্বের ক্রিয়াকলাপ। ২০১৬ সালের ৩১ অগস্ট যখন সুপ্রিম কোর্ট সিঙ্গুর মামলার রায় দিল তার পরও ভারতের সব থেকে বড়ো কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখার নেতৃত্ব যে ভাবে তাঁদের নিজেদের পার্টির পলিটব্যুরোর বিবৃতিকে উপেক্ষা করেছিল এবং পার্টির মুখপত্রে সেই রায়কে গুরুত্ব না দিয়ে 'যা করেছি বেশ করেছি' মার্কা প্রবন্ধ লিখলেন তা শুধু হাস্যকর নয় বরং অনেক বাম মনোভাপন্ন ও প্রগতিশীল মানুষকে ওই পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করল। যথারীতি ওই রায়ের পরে বিভিন্ন উপনির্বাচনগুলোতে গ্রামীণ মানুষের মধ্যে সিপিআই(এম)-এর ভোট আরও কমতে থাকল আর বর্তমান শাসক দলের জনসমর্থন উত্তরোত্তর বাড়তে থাকল।

২০১১ সালে তখন বামফ্রন্ট জমানা প্রায় যাব-যাব করছে। বামফ্রন্টের বড়ো শরিকের মুখপত্রের এক ভালো সাংবাদিক অশোকবাবুর বাড়ি গিয়েছেন। আলাপ আলোচনা শেষে সেই সাংবাদিক অশোকবাবুকে অতি বিনয়ের সঙ্গে প্রণাম করতে গেলেন। উনি দ্রুত পা টেনে নিলেন এবং কিঞ্চিৎ বিড়ম্বনার মধ্যে পড়লেন। ভক্তি উনি পছন্দ করতেন না। আধুনিক মানুষ ছিলেন। যুক্তিনির্ভর মনোজ্ঞ আলোচনা ভালবাসতেন। আজকের পৃথিবীতে যেখানে যুক্তির জায়গায় বিভিন্ন বাবাজি-মাতাজি ভক্তি নির্ভর বুজরুকি ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে এবং দিনের পর দিন অযৌক্তিক বাণী প্রচার করে যাচ্ছে সেখানে এহেন মানুষের বুদ্ধিদীপ্ত লেখা এবং সর্বোপরি প্রশ্নাত্মক মানসিকতার অভাববোধ করবে কলকাতা শহর তথা ভারতীয় উপমহাদেশের পাঠক।

লেখক সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সাইন্সেস, কলকাতায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক